যুগান্তর

তারিখ ... 7 FEB 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১/ ... ৬ ...

ফাঁসি : চারজনের যাবজ্জীবন

১ম পৃষ্ঠার পর

ও তছলিম উদ্দিন মন্টুর বিরুদ্ধে আনীত দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় বর্ণিত অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় তাদেরকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। তাদের প্রত্যেককে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। অন্যদিকে মহিউদ্দিন, হাবিব খান, ছোট সাইফুল এবং শাহজাহানের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/১২০(বি) ধারায় বর্ণিত অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় তাদের প্রত্যেককে গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়ার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। ওই অর্থ চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আসামিদের সম্পত্তি ক্রোকপূর্বক ও বিক্রি করে আদায় করবেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা এ রায়ের প্রত্যায়িত কপি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবেন বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়। রায়ে অধ্যাপক ইদ্রিছ মিয়া চৌধুরী, জহিরুল হক, তোফাজ্জল আহমদ এবং শিবির নাসিরের বিরুদ্ধে আনীত দণ্ডবিধির ৩০২/১২০(বি)/৩৪ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ না হওয়ায় তাদের প্রত্যেককে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। অন্য কোন মামলায় প্রয়োজন না হলে তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়।

মামলায় সরকার পক্ষে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পিপি আহমেদ কামরুল ইসলাম সাজ্জাদ ও অ্যাডভোকেট সাধনময় ভট্টাচার্য এবং আসামি পক্ষে আহসানুল হক হেনা, আহমদ হোসেন, বদিউল আলম এবং মঞ্জুর আহমদ আনসারী প্রমুখ মামলা পরিচালনা করেন।

প্রতিক্রিয়া : রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সরকার পক্ষে নিয়োজিত কৌসুলি স্পেশাল পিপি কামরুল ইসলাম সাজ্জাদ এবং অ্যাডভোকেট সাধনময় ভট্টাচার্য যুগান্তরকে বলেন, এ রায়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত এবং বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত আসামিদের ব্যাপারে উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে কিনা এ রকম এক প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, এ ব্যাপারে মামলার নথিপত্র বিবেচনা করে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামি পিচ্চু নাসির, বাইট্টা আলমগীর, আজম এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হাবিব খান ও মহিউদ্দিনের পক্ষে নিয়োজিত কৌসুলি মঞ্জুর আহমদ আনসারী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, প্রদত্ত রায়ে তিনি অসন্তুষ্ট। তারপরও এ রায় মাথা পেতে নিয়ে তিনি এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করবেন।

এদিকে রায়ের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য নিহত অধ্যক্ষের জামালখানের বাসায় গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। বাসা তালাবদ্ধ ছিল। তবে বাসায় কড়া পুলিশ পাহারা ছিল। অবশ্য নিহত অধ্যক্ষের পুত্র ইঞ্জিনিয়ার সৈকত মুহুরী মোবাইল ফোনে সাংবাদিকদের দেয়া প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, আদালত যাদের দোষী মনে করেছে, তাদের সাজা দিয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

মামলায় বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত তিন অধ্যাপক তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, আদালতের রায়ের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে তারা ষড়যন্ত্রের শিকার। তারা এ রায়ের জন্য আল্লাহর কাছে শোকরিয়া প্রকাশ করেন।

২০০১ সালের ১৬ নভেম্বর নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী জামালখানের বাসায় নৃশংসভাবে খুন হন। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপর সংঘটিত এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সরকারকে বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যেই চট্টগ্রামে অবস্থানরত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী নিহতের বাসায় আসেন এবং তার পরিবারকে সান্ত্বনা ও খুনিদের বিচারের আশ্বাস দেন। পরে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাও নিহতের বাসায় আসেন এবং নিহতের পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। হত্যাকাণ্ডের ১ বছর ২ মাস ২০ দিনের মাথায় এবং মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে আসার ১ মাসেরও কম সময়ে গতকাল এ রায় ঘোষণা করা হল।

উমা মুহুরীর বক্তব্য : অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর স্ত্রী ও মামলার বাদী উমা মুহুরী গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মামলার রায় সম্পর্কে একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন। এতে তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আদালতের এ রায়ের মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার এ শুভ সূচনা বাংলাদেশের মানুষকে আশ্বস্ত করেছে। সরকারের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে। খালাসপ্রাপ্ত চার আসামির ব্যাপারে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি সাক্ষী সাবুদ ও রায় পর্যালোচনা করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করার ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। তিনি তার পুত্র, দু'কন্যা; পরিবারের অন্যান্য সদস্য সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। তিনি মন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, চট্টগ্রামের মেয়র, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, পুলিশ কমিশনার, পুলিশ বিভাগসহ এ ঘটনায় যারা সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমি চাই এভাবে সব হত্যাকাণ্ডের বিচার হোক।

দণ্ডপ্রাপ্ত ৮ আসামির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি তছলিম উদ্দিন মন্টুর বাড়ি ফটিকছড়ি উপজেলার ধর্মপুর গ্রামে। তার পিতার নাম দেলোয়ার হোসেন। বাইট্টা আলমগীরের পিতা মৃত ওমর ফারুক। তার বাড়ি ফটিকছড়ি উপজেলার মানুপুরে। সে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। পিচ্চু নাসিরের বাড়ি বায়েজিদ বোস্তামী থানাধীন চালিতাতলীতে। তার পিতার নাম হাবিব উল্লাহ। আজমের পিতার নাম নজির আহমদ। তাদের বাড়ি ফটিকছড়ি উপজেলার আমতলী মেম্বার বাড়ি। অন্যদিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে শাহজাহান নাজিরহাট কলেজের কেরানী। তার পিতার নাম ফকির মোহাম্মদ আলী। বাড়ি নোয়াখালী জেলার সুধারাম উপজেলার চরগোল্লায়। সাইফুলের বাড়ি বায়েজিদ বোস্তামী থানাধীন বালুচরা কুলগাঁও এলাকায়। সে মৃত সৈয়দুর রহমানের পুত্র। হাবিব খানের পিতার নাম খাদেম আলী খান। তার বাড়ি হাটহাজারী উপজেলার মাদার্শায়। মহিউদ্দিনের বাড়ি হাটহাজারী উপজেলার মন্দাকিনী গ্রামে। তার পিতার নাম এলাহী বক্স। মহিউদ্দিন এ মামলায় খালাসপ্রাপ্ত আসামি শিবির নাসিরের ছোট ভাই।

সাংবাদিকের ওপর চড়াও : সকালে আদালতে আনার সময় শিবির ক্যাডার নাসির সাংবাদিকের ওপর চড়াও হয়। আজকের কাগজের ফটো সাংবাদিক সোহেল রানা ছবি তুলতে গেলে কড়া পুলিশ পাহারার মধ্যেও নাসির ওই ফটো সাংবাদিকের ক্যামেরা ঝাপটে ধরে এবং তাকে কিল-ঘুষি মারে।

তিন অধ্যাপক মুক্ত : মুহুরী হত্যা মামলার রায়ে বেকসুর খালাস পাওয়ার পর নাজিরহাট কলেজের তিন অধ্যাপক যথাক্রমে ইদ্রিছ মিয়া চৌধুরী, জহিরুল হক এবং তোফাজ্জল আহমদকে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী অন্য কোন মামলা না থাকায় আদালত থেকেই মুক্তি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে হাইকোর্ট থেকে জামিনে থাকা প্রথমোক্ত দু'জনকে রায়ের তারিখ ঘোষণার দিন জামিন বাতিল করে আদালত জেল হাজতে পাঠিয়ে দেন এবং অন্যজনকে মানবিক কারণে জামিন বহাল রেখে আইনজীবীর জিম্মায় দিয়েছিলেন। খালাসপ্রাপ্ত অপর আসামি শিবির ক্যাডার নাসিরের বিরুদ্ধে আরও মামলা থাকায় গতকাল তাকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ফ্লাশব্যাক ঘটনা : ২০০১ সালের ১৬ নভেম্বর। শুক্রবার সকাল ৭টা। চট্টগ্রাম মহানগরীর কেন্দ্রস্থল জামালখান রোডের বাসায় দরজা-জানালা খুলে গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর স্ত্রী উমাকৃষ্ণ মুহুরী। ঠিক সে সময় তাদের বাসায় প্রবেশ করে চার দুর্বৃত্ত। এর মধ্যে তিনজন ছিল অস্ত্রধারী, অপর একজন নিরস্ত্র। তাদের একজন উমা মুহুরীকে ভেতরের রুমে আটকে রাখে। অপর দু'জন অধ্যক্ষ মুহুরীকে শয়ন কক্ষ থেকে কথা আছে বলে ড্রইং রুমে ডেকে নিয়ে আসে। সোফায় বসিয়ে কথা বলার ছলে তারা তার মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে পরপর দু'টি গুলি করে একযোগে সবাই পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী উমা মুহুরী বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় নাজিরহাট কলেজ পরিচালনা কমিটির অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে বিরোধ ও মামলা-পাল্টামামলার জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়।

তদন্ত ও বিচার : ঘটনার পর দিন ১৭ নভেম্বর নাজিরহাট কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক ইদ্রিছ মিয়া চৌধুরী এবং জহিরুল হককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২১ নভেম্বর গ্রেফতার করা হয় এজাহারভুক্ত অপর আসামি একই কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক তোফাজ্জল আহমদকে। ২০০২ সালের ৪ জুলাই নগরীর বাকলিয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার হয় কিলিং স্কোয়াডের সদস্য তছলিম উদ্দিন মন্টুকে। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ওইদিনই উদ্ধার করা হয় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একে-৫৬ রাইফেল এবং একটি সিক্রেট পিস্তল। ধৃত মন্টু ২০০২ সালের ১১ জুলাই মহানগর হাকিম আতাহার আলীর আদালতে ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক ৩২ পৃষ্ঠার জবানবন্দি প্রদান করে। মূলত তার জবানবন্দির মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে ঘটনার নেপথ্য কাহিনী, হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী, কিলিং স্কোয়াডে কারা ছিল এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ।

কোতোয়ালি থানার ওসি রুহুল আমিন ছিদ্দিকী, এসআই মাঈনুদ্দিন ভূইয়া, ডিবির পরিদর্শক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ মামলার তদন্ত করেন। সর্বশেষ তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম এ মামলায় নাজিরহাট কলেজের তিন অধ্যাপকসহ ১২ জনকে আসামি করে ঘটনার বর্ষপূর্তির ঠিক দু'দিন আগে ২০০২ সালের ১৪ নভেম্বর সিএমএম আদালতে এ মামলার চার্জশিট দাখিল করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল মামলাটি বিচারের জন্য নবগঠিত দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল চট্টগ্রাম বিভাগীয় আদালতে প্রেরণ করে ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি। এ আদালতের বিচারক এম হাসান ইমাম ৪ জানুয়ারি মামলার চার্জ গঠন করেন। চার্জ গঠনের পর ১৩ কার্য দিবসে এ মামলায় ২৬ সাক্ষীর মধ্যে নিহতের স্ত্রী উমা মুহুরী, পুত্র ইঞ্জিনিয়ার সৈকত মুহুরী, মহানগর হাকিম আতাহার আলীসহ ২৩ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন। অপর তিনজন সাক্ষীর মধ্যে একজনের মৃত্যু হওয়ায় এবং দু'জন পলাতক থাকায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। সাক্ষ্য প্রদানকারী ২৩ জনের মধ্যে ৫ জন অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করায় সরকার পক্ষ তাদের বৈরী ঘোষণা করেন।

মন্টুর ১৬৪ ধারা জবানবন্দি : জবানবন্দিতে সে বলেছে, '৯৭ সালে চট্টগ্রাম কারাগারে থাকার সময় তার সঙ্গে 'শিবির ক্যাডার নাসিরের' সখ্য গড়ে ওঠে। নাসির যখন কুমিল্লা জেলে তখন তার ভাই নাজিম এবং চাচাতো ভাই মমতাজ খুন হয়। তখনও নাজিরহাট কলেজ কমিটিতে প্রভাব বিস্তার নিয়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধ চলছিল। নাসিরের বদ্ধমূল ধারণা ছিল তার দুই ভাই হত্যার পেছনে অধ্যক্ষ মুহুরীর হাত ছিল। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর নাছিরকে কুমিল্লা জেল থেকে চট্টগ্রাম জেলে নিয়ে আসা হয়। জেল থেকে সে তার ছোট ভাই মহিউদ্দিনের মাধ্যমে নাজিরহাটের হুমায়ুনের কাছে (শিবির ক্যাডার) মুহুরীকে হত্যার প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু হুমায়ুনের পিতার সঙ্গে মুহুরীর ঘনিষ্ঠতা এবং সম্পর্ক থাকায় হুমায়ুন ওই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। পরে সে শিবির ক্যাডার হাবিব খানের কাছে মহিউদ্দিনের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠালে হাবিব খান রাজি হয়। হাবিব খান ২০০১ সালের ১০ নভেম্বর তাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেকে পাঠায়। ওই দিন হাবিব খানের সঙ্গে গোপন বৈঠক হয়। বৈঠকে নাসিরের ছোট ভাই মহিউদ্দিন, পিচ্চু নাছির, ছোট সাইফুল, আজম ও বাইট্টা আলমগীর উপস্থিত ছিল।

জবানবন্দিতে মন্টু আরও বলেছে, ওইদিনই অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় এবং কোন দিন কীভাবে মুহুরীকে হত্যা করে হবে তা ঠিক করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ১৫ নভেম্বর ২০০১ তারিখে মন্টুর কাপাসগোলার বাসায় আসে। পরদিন ১৬ নভেম্বর মন্টু, পিচ্চু নাছির, আলমগীর, আজম ও ছোট সাইফুল একটি ট্যাক্সি নিয়ে অধ্যক্ষ মুহুরীর জামালখানের বাসার সামনে পৌঁছে। সাইফুলকে ট্যাক্সি পাহারায় রেখে অন্য চারজন গলি বেয়ে মুহুরীর বাসায় যায়। আজম ও আলমগীর বাসায় দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে অধ্যক্ষের স্ত্রী উমা মুহুরীকে আটকে রাখে। মন্টু দরজায় পাহারায় থাকে। পিচ্চু নাসির অধ্যক্ষকে শয়ন কক্ষ থেকে ডেকে নিয়ে এসে ড্রইং রুমের সোফায় বসিয়ে মাথায় একে-৫৬ রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে। এরপর সবাই একযোগে পালিয়ে যায়।